The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে ভূমি ব্যবস্থা তুলনা : একটি সমীক্ষা

Sukeshi Pal
Assistant Teacher, 73 No. Ramna Basantapur Primary School, Murshidabad, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400056

Abstract

ভূমি অর্থাৎ জমি, এই জমির সাথে যাদের স্বত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তারা হলেন গ্রামীণ কৃষক সমাজ। জমিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ঋকবৈদিক যুগে জমির মালিকানা, ভূ-সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রের অধিকার এবং জমির মালিকানা বিষয়ে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-মৌর্য যুগ অর্থাৎ খ্রী: পূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিষয়টি স্পষ্টতা লাভ করে। মৌর্যযুগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত মালিকানা— দুই ধরণের জমির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতে ১৭৯৩ সালে ২২ মার্চ বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস পূর্ব ভারতে চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের অন্যতম ফলাফল ছিল কৃষির বাণিজ্যিকরণ। ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রীড ও তার সহকারী টমাস মনরো ১৮২২ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দ: ভারতে প্রচলিত ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে। এইভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় দেখা যায় মহলওয়ারি বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। ইংরেজদের তৈরি করা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা দেশের চিরচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয়। স্বাধীন ভারতে সরকার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নয়নে সচেষ্ট হন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মূলত কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল 2.1%, কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধি গিয়ে পৌঁছায় 3.6%। পরবর্তী সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়। সেগুলি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক ছিল না অর্থাৎ কৃষির ওপর গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ মূলত কৃষিকেন্দ্রিক দেশ। ভারতবর্ষ মূলত শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর হয়ে ওঠায় গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতি ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ছে।

Keywords: *ভূমি, মানুষ, ঐতিহাসিক, মালিক, পদ্ধতি*

Introduction

দুই বিঘা জমি
শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূ - স্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা - ওটা দিতে হবে।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমি সম্পত্তি বলতে সাধারণত জমিজমা, বাড়িঘর, বা স্থাবর সম্পত্তিকে বোঝায়। এটি মানুষের মালিকানাধীন যা সহজে সরানো যায় না। ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাস রচনায় গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের উল্লেখ ইতিহাস অপরিহার্য। কারণ জমির সঙ্গে যাদের স্বত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তারাই গ্রামে বাস করত। আবার ভূমি রাজস্ব নিরূপণ ও তা সংগ্রহের জন্য যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এই গ্রামই ছিল সেই কর্মকৃতির পটভূমি। আমাদের আলোচনার বিষয় হলো প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে ভূমি ব্যবস্থার তুলনা, যেখানে দেখা যায় যে জমি বা ভূ - সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মানুষে-মানুষে, রাজায়-রাজায় বিবাদ চলে এসেছে। প্রাচীন কাল অর্থাৎ ঋগ্বৈদিক থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সময়কালের দিকে তাকালে দেখা যায় যে জমির মালিক কে ছিলেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন জমির মালিক ছিলেন রাজা। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে - জমির মালিক ছিলেন ব্যক্তি বা পরিবার। ৭/১/৮ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে - যে গোষ্ঠীর সম্মতি অনুসারে রাজা ব্যক্তিগতভাবে জমি অধিকার করতে পারেন। পরবর্তী সময় অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতে দেখা যায় যে ব্রিটিশ সরকার জমি পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা অবলম্বন করেছেন। সেখেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আমরা যদি পূর্বভারতের দিকে তাকাই সেক্ষেত্রে দেখা যাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, উত্তর - পশ্চিম ভারতে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত ও দক্ষিণ ভারতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ইত্যাদি। জমি অর্থাৎ ভূমি হচ্ছে প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ এর ওপর বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাকে বাসের যোগ্য অথবা চাষযোগ্য করে গড়ে তুলছে। আমরা এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব যে ভূমির ওপর এই সমস্ত পদ্ধতি বা নীতির মাধ্যমে সরকার যে রাজস্ব আদায় করে চলেছে তা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ অর্থাৎ বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতি অর্থাৎ যেখানে তাদের জীবন ধারণের জন্য বেশিরভাগ সময় জমির ওপর নির্ভর করতে হয় সেখানে দাঁড়িয়ে এই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি কিভাবে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে চলেছে। এছাড়া এই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি ভারতীয় অর্থনীতিকে কিভাবে পরিবর্তন করে চলেছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করব। এছাড়া এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে কিভাবে কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে চলেছে।

Content

প্রথমে আমরা আলোচনা করব ঋকবৈদিক যুগে জমির মালিকানা, ভূ - সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের অধিকার এবং জমির প্রকৃত মালিক সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতনৈক্য বিষয়ে। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন - "জমির প্রকৃত মালিক ছিল রাষ্ট্র"। অন্যদিকে ঐতিহাসিক কে. পি. জয়সোয়াল স্মিথের মতের বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন— "ব্যক্তি ও পরিবারকে জমির মালিক বলে মনে করেন। ডি. ডি. কোসাম্বী মনে করেন "জমি গোষ্ঠির সম্পত্তি ছিল, ব্যক্তি বা পরিবারের ছিল না।

ঋগ্বেদে বিভিন্ন সূক্তেই ক্ষেত্রপতি অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের অধিপতির কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্যই পৃথক পৃথক ক্ষেত্রপতির অস্তিত্বের কথা সেযুগে বিশ্বাস করা হতো।

পরবর্তীকালে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমির মালিকানা ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজা অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করতে থাকে। এখানে ঋগবৈদিক থেকে পরবর্তী সময়ের মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ৭/১/৮ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, গোষ্ঠীর সম্মতি অনুসারে রাজা ব্যক্তিগতভাবে ভূমি অধিকার করতে পারেন। ডঃ ইউ. এন. ঘোষাল বলেন যে ধর্মশাস্ত্রে মালিকানা ও সংকুচিত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মালিকানা বোঝাতে 'স্বামিত্ব' ও শুধুমাত্র ভোগকারী অর্থে 'ভুজ' শব্দটি ব্যবহৃত হতো।

মহাভারতে কর আদায়ের যে তথ্য পাওয়া যায় - তাতেও মনে হয় যে, ভূমির ওপর কৃষকের অধিকারই স্বীকৃত ছিল।

প্রাক - মৌর্যযুগ অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিষয়টি বৈধতা লাভ করে, যদিও এই মালিকানার প্রকৃতি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ছিল। বৌধায়ন, গৌতম, আপস্তম্ব ও বশিষ্ঠ - এই চারটি প্রাচীন ধর্মসূত্রের সাক্ষ্য থেকে যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন কানুনের পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সপক্ষে অনুমান করা চলে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের কাহিনীতেও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক কর্তৃক অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে জেতবন নামক বিখ্যাত উদ্যান ক্রয় ও তা বুদ্ধকে উপহার প্রদানের বিখ্যাত কাহিনী থেকে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তা বিক্রয়, হস্তান্তর ও দানের অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মৌর্যযুগে ভূমি ব্যবস্থা এবং ভূমিরাজস্ব বিষয়ে মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য গ্রিক লেখকদের বর্ণনা মূলত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেগাস্থিনিস, অ্যারিয়ান, স্ট্র্যাবো, ডায়োডোরাস প্রমুখ গ্রিক লেখকদের মতে 'রাজাই ছিলেন দেশের সকল জমির মালিক'। রাজা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির জমির ওপর অধিকার নেই। ডায়োডোরাসের মতে প্রজারা রাজাকে জমির মালিক হিসেবে ফসলের ১/৪ খাজনা হিসেবে প্রদান করে। রাজা রাজ্যের সব ভূমির মালিক ছিলেন না। রাজার মালিকানাধীন কিছু খাস ভূমি অবশ্যই ছিল। অর্থশাস্ত্রে এই ধরণের ভূমিকে বা ভূমির ফসলকে 'সীতা' বলা হয়েছে।

"মিলিন্দপঞহো"তে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে জঙ্গলকীর্ণ জমিকে যদি কোনো ব্যক্তি চাষ - আবাদের উপযোগী করে তোলেন - তাহলে তিনিই হবেন ভূমির মালিক। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় জমিরও উল্লেখ আছে।

মৌর্যযুগের ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত মালিকানা - দুই ধরণের জমির অস্তিত্ব উল্লেখ করা যায়।

গুপ্তযুগে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত মীমাংসাসূত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী সম্ভবত গুপ্তযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বলেন ভূমির ওপর রাজার যতখানি অধিকার, প্রজাদের অধিকারও ঠিক ততখানি।

'ব্যবহার - ময়ূখ' বলা হয়েছে যে প্রয়োজন হলে রাজা মূল্যের বিনিময়ে প্রজাদের কাছ থেকে ভূমি কিনবেন।

জমির ওপর গ্রামবাসীদের যৌথ মালিকানার সমর্থনে সমকালীন দুটি লেখার উল্লেখ করা হয়। (১) মহারাজাধীরাজ ধর্মরাজার ফরিদপুর তাম্রশাসন। (২) গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ পদস্থ রাজপুরুষ আম্রকার্দবের সাঁচীর প্রস্তর লেখ।

ফরিদপুর লেখে বলা হয়েছে - জমির বিক্রয়লব্ধ অর্থের ১/৬ রাজকোষে জমা পড়বে। এর থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্টাংশ গ্রামসভার ভাণ্ডারে জমা পড়ত। সাঁচী লেখের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেখানে পঞ্চমণ্ডলী বা গ্রামসভার উল্লেখ আছে। এবং এই গ্রামসভার অনুমোদনে গ্রামে আম্রকার্দব জমি দান করেছিলেন। সাঁচী লেখে গ্রামসভা বা পঞ্চায়েতের উল্লেখ প্রসঙ্গে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, সংগতি সম্পন্ন গ্রামবাসীরা বাস্তুভূমি ও কৃষিক্ষেত্রের মালিকানা ভোগ করতেন এবং ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ তারা রাজা তথা রাষ্ট্রকে রাজস্ব হিসেবে প্রদান করতেন।

গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৮০ - ৪১৫) চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন এবং উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেন। ৩৯৯ - ৪১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি ভারতে অবস্থান করেন। ফা - হিয়েনের বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রের খাস জমি থেকেই রাজা কর লাভ করতেন। চীনা পর্যটকের মতামতের ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, গুপ্তদের আমলে রাষ্ট্রই ছিল দেশের সকল জমির একমাত্র মালিক।

ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দান করা ভূমি সাধারণত 'ব্রহ্মদেয়' বা 'অগ্রহার' নামে পরিচিত ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের আমলে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই অগ্রহার ভূমির অস্তিত্ব দেখা যায়। অগ্রহার দানপত্রে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের লোক - বিশেষত বৈশ্যদের প্রচুর জমি দান করা হতো। তবে এইসব দানপত্র ছিল শর্তসাপেক্ষ, শর্তপূরণ করা না হলে রাজা তার দানপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করতেন। গুপ্ত সম্রাটদের ভূমিদানপত্র এবং অগ্রহার দানপত্র সমূহের লিপি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভূমিদানপত্র এবং অগ্রহার দানপত্রের জন্য বহু লোক বিশেষত ব্রাহ্মণরা প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর জমি মালিকানা ভোগ করলেও এবং নানারূপে বিশেষ সুযোগ লাভ করলেও কোনোভাবে শর্ত লঙ্ঘিত হলে রাজা জমি পুনঃগ্রহণ করতে পারতেন।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই যে ১৭৮৪ সালে পিটের ভারত শাসন আইনে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলা হয়। সেই অনুসারে ১৭৮৯ খ্রিঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি বাংলা ও বিহারে এবং ১৭৯০ সালে উড়িষ্যায় জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থা 'দশশালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে কোম্পানির পরিচালক সভার অনুমোদন পাওয়ার পর ১৭৯৩ খ্রিঃ ২২শে মার্চ 'দশশালা বন্দোবস্ত' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এই ব্যবস্থা অনুসারে স্থির যে - (১) জমিদার, তালুকদাররা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের রাজস্ব সরকারকে প্রদান করে বংশানুক্রমিকভাবে জমি ভোগ করবে। (২) নির্দিষ্ট দিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই সমস্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে, অন্যথায় জমিদারি বাজেয়াপ্ত হবে। (৩) ভবিষ্যতে খরা, বন্যা, মহামারি অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও রাজস্ব মকুব হবে না।

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। এর পেছনে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীর কল্যাণসাধন ও বেশি রাজস্ব আদায় করা।

এই ব্যবস্থায় সরকারের বার্ষিক আয় বাড়লেও ভবিষ্যতে ভূমিরাজস্ব থেকে সরকারের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমে যায়।

এই ব্যবস্থায় জমির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে শিল্পপতিরা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করার বদলে জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম ফলাফল হল কৃষির বাণিজ্যিকরণ। বণিক - মহাজনেরা জমির মালিক হওয়ায় ধান, গমের পরিবর্তে লাভজনক ফসল নীল, আম, পাট, তুলো চাষে চাষীদের বাধ্য করে। এর ফলে কৃষকের অন্নাভাব বৃদ্ধি পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটি কুফল হলো 'পত্তনী প্রথার' উদ্ভব। নিজেদের সুবিধার্থে তারা তাদের জমিদারিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে দেয়। নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের শর্তে অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের তা 'পত্তনী' দেন। এই পত্তনীদারদের বলা হতো 'সদর পত্তনিদার'। এরা আবার অন্যদের জমি পত্তনি দিত, তাদের বলা হতো 'দর-পত্তনিদার'। এর পরের স্তর ছিল 'দর - দর পত্তনিদার'। এর ফলে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই বন্দোবস্ত কোম্পানি, জমিদার ও কৃষক সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক আয়ে নিশ্চয়তা আসে। (২) রাজস্ব সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে কোম্পানি বিচার - বিভাগীয় ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মনোনিবেশ করতে থাকে।

এই ব্যবস্থা পুরোপুরি কোম্পানির পক্ষে সুবিধাজনক হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতি বছর কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদারদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। মোগল আমলে জমিদার ছিলেন বংশানুক্রমিক রাজস্ব সংগ্রাহক, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা জমির মালিকে পরিণত হয়। রায়ত বা কৃষক জমিদারের প্রজায় পরিণত হয়। সুতরাং এই বন্দোবস্ত জমিদারের মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রায়ত বা কৃষক শ্রেণী। জমির ওপর জমিদারের মালিকানা স্বত্ব ছিল কিন্তু কৃষকের মালিকানা স্বত্ব ছিল না। জমিদার ইচ্ছামতো প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করতে পারতেন এবং প্রজার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে জমিদারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এই আইনকে "ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালা কানুন" বলে অভিহিত করেছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পশ্চিম ভারতে কী ধরণের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার রিড ও তাঁর সহকারট থমাস মনরো - এই অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৮২০ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তা রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। টমাস মনরোকে এই ব্যবস্থার জনক বলা হয়।

এই ব্যবস্থা অনুসারে— (১) সরকারের সাথে কৃষকের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। (২) এই ব্যবস্থায় কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল না। (৩) উৎপাদনের ভিত্তিতে জমিকে ৯টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (৪) জমির ওপর কৃষকের মালিকানা স্বত্ব ছিল না। (৫) রাজস্বের হার ছিল উঁচু - উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ। সাধারণত কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর অন্তর রাজস্বের হার পরিবর্তন করা হতো।

এই ব্যবস্থার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন— (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। (২) রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে জমিদারের অস্তিত্ব ছিল না। রাজস্ব আদায় করত মূলত সরকার বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে খাজনার হার ইচ্ছামতো বৃদ্ধি করা যেত কিন্তু রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে খাজনার হার বৃদ্ধি পেত মূলত কুড়ি - ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে ভালো-মন্দ দুটি দিকই ছিল। (১) সরকারের পক্ষে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক ছিল। কারণ তারা কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করতে পারত। (২) এই ব্যবস্থার ফলে দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিলোপ ঘটে এবং সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব লক্ষ্য করা যায়। (৩) এই ব্যবস্থার ফলে প্রচলিত ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে।

এবার আমরা আলোচনা করতে পারি গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর - পশ্চিম ভারত ও মধ্য ভারতে প্রচলিত মহালওয়ারি বন্দোবস্ত সম্পর্কে। ১৮২২ খ্রিঃ 'সপ্তম আইন' (Regulation VII) দ্বারা এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। হোল্ট ম্যাকেঞ্জিকে এই ব্যবস্থার জনক বলা হয়

এই ব্যবস্থা অনুসারে সরকার রায়তদের সঙ্গে সরাসরি ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত না করে সমষ্টিগতভাবে এক একটি গ্রামের সাথে রাজস্বের বন্দোবস্ত করত। গ্রামের অধিবাসীরা যৌথভাবে এই রাজস্ব মেটাতে বাধ্য ছিল। জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে রাজস্বের হার স্থির হতো। প্রতিটি মৌজা বা মহালের সাথে ২০ - ৩০ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত হতো।

এই ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— (১) এই ব্যবস্থায় জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর স্থান দখল করেন গ্রাম - প্রধান। সব কিছুর দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হওয়ায় তারা স্বার্থান্বেষী হয়ে প্রজাদের ওপর জুলুম চালাতে থাকে। (২) এতে রাজস্বের হার যথেষ্ট চড়া ছিল যা দেবার ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। ফলে ১৮৫৫ সালে সরকার বাধ্য হয়ে রাজস্বের হার কমায়। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, "এই ব্যবস্থায় ধন - সঞ্চয় বা মানুষের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রের চাহিদার ওপরেও কোনো সীমারেখা টানা হয়নি।" অতিরিক্ত কঠোরতার ফলে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

ইংরেজদের তৈরী করা নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয় জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। এর ফলে দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। পূর্বে ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার পদ্ধতি চালু ছিল, ইংরেজরা এই নীতি বাতিল করে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের রীতি চালু করে। এর ফলে প্রজারা ফসল বিক্রি করে রাজস্ব মেটাত ও অন্যান্য নিত্য জিনিস ক্রয় করত। গ্রামীণ যৌথ পরিবার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে, এক কথায় গ্রামীণ জীবনে এক বিপ্লব ঘটে যায়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা যদি বর্তমান সময়ের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছেন। সেরকম একটি পরিকল্পনা হলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্য সরকারের নীতি নির্ধারণ। সে দিকে আমরা মোট বারোটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেখতে পাই। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করব প্রথম ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দিকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল হলো ১৯৫১ – ১৯৫৬। অর্থাৎ সেসময় মাত্র ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি হলো কৃষির ওপর গুরুত্ব আরোপ। অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি। এক্ষেত্রে বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ২.১%, কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধির হার গিয়ে পৌঁছায় ৩.৬%। অর্থাৎ কৃষির ওপর নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর যে অগ্রগতি হয়েছিল অনেকটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। পরবর্তী যে পরিকল্পনার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখব তা হলো তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এর সময়কাল ছিল ১৯৬১ – ১৯৬৬ খ্রিঃ। এখানে কৃষি ও শিল্প উভয়ের ওপর নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়। এখানে বার্ষিক বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৫.৬%, কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল ২.৮৪%। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পিছনে যে কারণগুলো দায়ী ছিল তা হলো এই সময় ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যেমন— (১) ভারত-চীন যুদ্ধ (২) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ।

এর ফলে এই সময় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে কৃষির ওপর গুরুত্ব কম দেওয়া হয়েছে।

উপরের বিবরণী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছিল মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল দেশ। আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলার দেশ। শস্য উৎপাদনের জন্য যে বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর প্রয়োজন তা আমাদের ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। প্রকৃতির সাথে মানুষের নিবিড় যোগ দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন ধরণের ফসলের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। যেখানে ধান, গম থেকে শুরু করে জোয়ার, বাজরা, রাগী প্রভৃতি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন হয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে কৃষিকেন্দ্রিক

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

দেশ। অর্থাৎ কৃষির ওপর নির্ভর করে যেখানে বেশিরভাগ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে কৃষির ওপর গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্রিক অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি আমরা গড়ে তুলি সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অর্থনীতি আবার খুব ভালো সুগম হবে। কৃষির ওপর নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। ভারতবর্ষ আবারও সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে।

References

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কবিতা — দুই বিঘা জমি

সিদ্দিকি, এন. এ., (১৯৯৭) মোগল রাজত্বে ভূমি রাজস্ব পরিচালন-ব্যবস্থা, কলিকাতা।

দাস, শাশ্বতী, প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ভারত - প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১২০০ খ্রীঃ, ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা – ৭৩।

মুখোপাধ্যায়, জীবন, ভারতের ইতিহাস (১৫২৬ — ১৯১৪), শ্রীধর পাবলিশার্স, ২০৯ বি, বিধান সরণী, কলকাতা – ৭০০০০৬।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026